International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue VI, July 2015, Page No. 26-32
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

দেশভাগ ও দেশত্যাগ: পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ

সঞ্জীবন মহলদার
সহকারী অধ্যাপক, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান, ভারত

Absrtact

The Partition of British India in August 1947 resulted in the largest migration movement in contemporary history. The Bengal Partition witnessed protracted migration of Hindus and Muslim minorities engendered by routine small-scale violence. But communal violence was not only the sole reason for Muslims to migrate from India to East Pakistan but also complicated economic and regional identities play a pivotal role. They had been given the 'option' by the Colonial government to choose whether they would continue work in Pakistan or in India. East Pakistan allowed the migrant to retain their old job. They gained there a more integrated social network as well as reduced competition, which allowed quicker job promotion. Temporary Muslim migrants who lived on one side of the border made use of the loose border security to move to the other side during harvest season or for the trade purposes. More importantly, the Bengali, Bihari and other regional identities further explain how Hindu-Muslim relation in Bengal were different from Punjab, because there was less violence in Bengal. An important aspect of the Bengali identity is that of Bengali nationalism, found their home land in Khulna, Jessore, Kusthia of East Pakistan. All districts were adjacent to the border. From Bengali literature we came to know that middle and lower class muslim migrants were too happy to get rid of the Hindu Zaminder but opposite scenario were also presented by many literary sources. We should note that the Left Politics in Bengal protested about the discussion of migration on the basis of their concept of communalism.

Keywords: Partition, Muslim, Migration, Communalism, Border

প্রায় দুশো বছর ধরে টানা শাসন করার পর ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার আগে দেশটির রাজনৈতিক মানচিত্রে চিরস্থায়ী পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তকে জাতিগত বিভিন্নতার ভিত্তিতে কেটে টুকরো করে জন্ম হয়েছিল স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের। বিভাজিত পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ পাকিস্তানে যুক্ত হয়েছিল এবং পূর্ব পাঞ্জাব ভারতেরই অংশ ছিল। অন্যদিকে বঙ্গদেশ ভেঙে হয়েছিল পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ববঙ্গকে যুক্ত করা হয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে। আর এই ভাঙাগড়ার মধ্যেই রয়েছে 'উদ্বাস্তু' উৎপাদন প্রক্রিয়ার গভীর সংযোগ।[১] প্রাথমিক পর্যায়ে পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া হিন্দু উদ্বাস্তুদের দুর্দশা, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সমস্যা ও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কথা আলোচনা হলেও যে বিষয়টি উপেক্ষিত রয়েছে তা হল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের সমস্যা। আর এই বাঙালি মুসলিমরাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বাঙালি মুসলিমদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলিমদের নিরন্তর পলায়নের পিছনে বা বাস্তবিকই কি ছিল পড়শি চোখগুলো রাতারাতি 'কেমন অচেনা হয়ে ওঠার ভয়' না কি তা নিছকই নব্য-পাকিস্তানের স্বপ্নকল্পের স্রোতে ভেসে পড়া?

দেশ ভেঙে গড়ে ওঠে নতুন দেশ। একই ধর্মের মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র বা homogeneous state গঠনের আড়ালে তাই জনগণের একাংশের সংখ্যালঘু হয়ে ওঠার ভ্রুকুটি। র‍্যাডক্লিফ রেখায় দেশ বিভাজনের পরে এদেশেও উদ্বাস্তু উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। যার প্রথম প্রহর থেকেই ওরা হয়েছিল দেশভাগের বীভৎসা। রাতারাতি

তাদের পরিচয় হয়েছিল সংখ্যালঘু। গবেষক স্যেনডেল ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসকারী যথাক্রমে মুসলিম ও হিন্দুদেরকে 'Proxy Citizen' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২] বাংলায় ৫৪ শতাংশ ও পাঞ্জাবে ৫৭ শতাংশ জনগণ মুসলিম ছিল। সরকারি সূত্রে হিন্দু ও মুসলিম জনগণের 'exchange' হয়েছিল। এই সূত্রে আরও বলা হয়েছে অনেকে ভারতে অপেক্ষা করতে চেয়েছিল কিন্তু নিয়মিত 'বলপূর্বক' তাদের দেশত্যাগ বাধ্য করা হয়েছিল। এই সময় বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েন পশ্চিমবঙ্গের বহু মুসলিম পরিবারকে ভিটেছাড়া করেছিল ও বাধ্য করেছিল দেশত্যাগ করতে।

দাঙ্গার পর কলকাতা মুসলিমদের কাছে নিরাপদ মনে হয়নি। তাদের অনেকে কলকাতার মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল। অনেকে কলকাতা ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে গিয়েছিল যা ছিল তুলনামূলকভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা জর্জরিত।[৩] অনেকে সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। এদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। কলকাতার অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত বস্তিগুলি থেকে মুসলিম কারিগর, শ্রমিকরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কলকাতার মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। একটি হিসাবে ১৯৪৬-৪৭ সালে ছিল ২৩ শতাংশ, তা ১৯৬১ সালে নেমে দাঁড়ায় ১২ শতাংশে।[৪] ১৯৫১ সালের আদমসুমারিতে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে কলকাতার জনসংখ্যার ৩২.৫ শতাংশ ছিল মুসলিম। ১৯৫১ সালে নেমে দাঁড়ায় ১৪.৪ শতাংশে।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে হাওড়ায় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। এর জেরে বহু মুসলিম শ্রমিক হাওড়া ছাড়ে। অশোক মিত্র তাঁর আত্মজীবনীতে হাওড়ায় তাঁর দাঙ্গা দমনের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।[৫] পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান শহরে মুসলিম লিগের প্রথম সারির নেতা আবুল হাসেমের বাড়তে আগুন লাগানো হয়। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনি সপরিবারে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। সীমান্তবর্তী নদীয়া জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম উৎখাত হন এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা তাদের ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ি দখল করে। কলকাতার বহু মুসলিম ব্যবসায়ী, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করে চলে যায়। সেই সময়কার সংবাদপত্রের পাতায় সম্পত্তি বিনিময়ের বহু বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। ১৯৬৭ সালে কলকাতার দাঙ্গা আবার বহু মুসলিমকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে। প্রায় ৮ লক্ষ মুসলিম সম্প্রদ্যের মানুষ এই সময় পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান।[৬]

তবে ১৯৪৭ সালের দেশ ও অভিপ্রায়ণের পেছনে গভীর আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৯৪০-এর দশকে উচ্চ শ্রেণির তথা এলিট ভূস্বামীরা জমিদার নামেও পরিচিত ছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের আমলে জমিদাররা অবদমিত হলেও কিছু করে রেখেছিল। সে কারণে তারা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে কৃষকদের জমি দখল করে হিন্দুরা। এই প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ হিন্দু জমিদার ধনী হয়ে উঠেছিল। তবে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জমিদার ও কৃষক কেউই কিন্তু পুরোপুরি হিন্দু বা মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৯৫০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারি ব্যবস্থার অবসান ঘটে। সকল জমি আসে নতুন গণতন্ত্রী সরকারের হাতে। এই সময় 'incentivised migration' ঘটে পূর্ব পাকিস্তানে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণির অভিপ্রায়ণকারীদের জমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সে জমি একদা জমিদারের দ্বারা দখলিকৃত হয়েছিল।[৭] অনেক মুসলিম এই নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানে অনেক উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখেছিল।

দেশবিভাগ সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনায় সরকারি কর্মচারীদের অভিপ্রায়ণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। তবে মুসলিম অভিপ্রায়ণকারীরা একসময়ে পূর্ব পাকিস্তানে যায়নি, যাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর ছিল। প্রথমেই গিয়েছিল আমলারা, যাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনে কর্মরত ছিলেন। মুসলিম সরকারি চাকুরিজীবীদের একাংশ 'অপশন' দিয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। সে সময় বাংলার ১৯ জন মুসলিম সিভিলসার্ভিসের অফিসারের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই পাকিস্তানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন । অধস্তন কর্মচারীরাও তাঁদের অনুসরণ করেন। ভারত ত্যাগ করে আমলারা তাঁদের 'job' বা 'পেশা'কে ধরে রেখেছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিযোগিতা কম থাকায় সেখানে উচ্চপদে 'দ্রুত' উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল বেশি।[৮] অনেক আমলা কোনো অপশন দেননি, আবার অনেকে ভিন্ন শহরকে পছন্দ করেছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন এই শহর ভারতের অংশ হবে। কিন্তু তা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[৯] তবে উদ্বাস্তুদের তুলনায় সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

আরও একদল মানুষ, যাদের অধিকাংশ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, দেশত্যাগ করেছিল ভালো সুযোগ সুবিধার আশায়। লক্ষণীয় যে জাতিভেদের কারণে বিভিন্ন হিন্দুরা কিছু কাজের ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিল। হিন্দু সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত sub-cast-রা বংশপরম্পরায় 'low-skilled'-এর কাজ করত যেমন বাণিজ্যিক সবজি চাষ। সেখানে উচু জাতের মানুষরা পারদর্শী ছিল ব্যাঙ্কিং, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে।[১০] কিন্তু হিন্দুদের অভিপ্রায়ণের ফলে এইসব উভয় ক্ষেত্রেই পেশাগুলিতে শূন্যতা তৈরি

হয়েছিল। সাধারণভাবে যেসব কর্ম তাদের কখনই উন্মুক্ত হত না, এমনকি প্রতিযোগিতাও হ্রাস পেয়েছিল। এইসব ক্ষেত্রগুলি পূরণ করতেই শিক্ষিত এমনকি অশিক্ষিত মুসলিমরা পূর্ববঙ্গে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন বাংলাদেশের প্রথিতযশা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানদের পরিবার কলকাতা থেকে খুলনা হয়ে ঢাকায় চলে যান।[১১]

মুসলিমদের দেশভাগের অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে সর্বশেষ ছিল সাময়িক বা কালের ওপর নির্ভরশীল অভিপ্রায়ণ। দেশভাগের সীমা অনেকের বাড়ি ও কৃষিজমিকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছিল। এছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আদান প্রদানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল। পূর্ববঙ্গ সরবরাহ করত কৃষিজাত পণ্য আর পশ্চিমবঙ্গ 'manufactured goods' উৎপন্ন করত, যারচাহিদা ছিল পূর্ববঙ্গে, পাকিস্তানে।[১২] দেশভাগের পরও এই অর্থনৈতিক কাজকর্মের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। পাসপোর্ট প্রক্রিয়া চালু হবার আগে আইনগতভাবে দেশত্যাগ শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালে। তবে বাংলা সীমান্ত পাঞ্জাব সীমান্তের মতো কঠোর নিরাপত্তার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না।[১৩] মুসলিম অভিপ্রায়ণকারীরা সীমান্তের একদিকে বসবাস করলেও দুর্বল সীমান্ত নিরাপত্তাকে কাজে লাগিয়ে তারা অন্যদিকে চাষবাস কিংবা ব্যবসার কাজে যেত। এই ঘটনা থেকে বলা যায় অভিপ্রায়ণ ছিল না, এটা ছিল সাময়িক এবং তা নির্ভর করত বাজারের ওঠানামার ওপর।

দেশভাগ ও অভিপ্রায়ণের পেছনে আঞ্চলিক সত্তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অনুমান করা হয় হিন্দু ও মুসলিম সত্তা অন্য পরিচিতিগুলোকে অবদমিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে দেশভাগ ও জনগণের অভিপ্রায়ণ। তবে বাঙালি সত্তা দেখিয়েছিল কেমন করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ছক পাঞ্জাবের থেকে আলাদা ছিল। বাংলা হিন্দু ও মুসলিমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতেন। এমনকি সংস্কৃতি, চিত্রকলা, সাহিত্য ছিল একই।[১৪] এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাঙালি সত্তার বড় দিক হল 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। এর ফলেই ব্রিটিশরা ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাকে ১৯০৫ ও ১৯১১-তে প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে বিভক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিল।[১৫] রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ বাঙালি সত্তার ওপরে সাময়িকভাবে ছায়া ফেলেছিল। ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির সময় থেকেই নিয়মিত সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল ঘটে আসছিল। তবে বাংলার হিন্দু-মুসলিমরা যে ধর্মীয় ও সামাজিক বহুত্ববাদের ভিত্তিতে বসবাস করত পাঞ্জাবে তা ছিল না।[১৬]

প্রাথমিক স্তরে যেসব উচ্চ এলিট শ্রেণি পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলেন তাঁরা প্রশাসনিক পদে আসীন হয়েছিলেন। এঁরা উর্দুভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু বাঙালাদেশীয়রা ছিল কম দক্ষ ও দরিদ্র। বাঙালিরা ছিল সংখ্যায় বেশি ও উর্দুভাষীরা ছিল মাত্র ৩ শতাংশ। উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।[১৭] স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মসংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রশাসনিক ক্ষমতার দিক থেকে লাভবান হয়েছিল।[১৮] এটা 'বাঙালি' ও 'অবাঙালি' মুসলিমদের মধ্য বিভেদ তৈরি করেছিল। এর ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছিল ভাষা আন্দোলন এবং সমাপ্ত হয়েছিল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে।

লক্ষণীয় যে বিহার থেকেও অনেক মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিবাদের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিল। অনেক এলিট মুসলিম করাচি যেতে ইচ্ছুক ছিল। পরে এটি পাকিস্তানের রাজধানী হয় এবং ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। করাচির জনগণ উর্দুভাষী ছিল, এমনকি করাচির শুধুমাত্র এলিটদেরই অনুমতি দিয়েছিল; যারা নতুন দেশ তৈরি করতে পারে। বিহারি মুসলিমদের পাঞ্জাবের সীমান্ত পছন্দের ছিল না তাই অনেকে বাংলা হয়ে করাচি গিয়েছিল। যাই হোক, পূর্ব পাকিস্তানের বিহারীদের পরে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, কারণ তাদের সঙ্গে উচ্চশ্রেণির মুসলিম অবাঙালিদের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। এই কারণেই যারা বিহার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিল তাদের মনে হয়েছিল অভিপ্রায়ণ সাময়িক। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অর্ধেকের বেশি বিহারি ধরা পড়েছিল এবং তারা 'রাষ্ট্রহারা রিফিউজি'-তে পরিণত হয়েছিল। কারণ ইসলামাবাদ নতুন রাজধানী হওয়ার পর পাকিস্থান তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।[১৯]

আঞ্চলিক সত্তার একটি বিশেষ দিককে গুরুত্ব দেওয়া উচিত যারা সীমান্ত অতিক্রম করেনি। অনেক মুসলিম আশা করেছিল ঝাড়খণ্ড তাদের গন্তব্য হবে কারণ তাদের মনে হয়েছিল ঝাড়খণ্ড পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড ভারতের অংশ হয়। এরা ছিল 'internally displaced' মুসলিম জনগণ। এরা পরে আর ভারত ত্যাগ করেনি। তার কারণ ছিল 'identity' (আত্মপরিচিতি) ও 'economy' (অর্থনৈতিক)। এরা জমি পরিত্যাগ করায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের হাতে অর্থ কম ছিল। আবার অনেকের মনে হয়েছিল পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালি ও ভাষা হল বিদেশি। স্বাভাবিকভাবেই তারা পূর্বপুরুষের স্থানকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিল।[২০]

পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলিম জনগণ বিভিন্ন কারণে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিল। তবে এখন প্রশ্ন হল পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগণ পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলকে তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন? কলকাতা, আসানসোল ও বর্ধমান শহরে মুসলিমদের প্রতিপত্তি ছিল বেশি। শহুরে মুসলিমদের নতুন দেশ নিয়ে সংশয়ও ছিল। পাকিস্তানে তারা কীভাবে গ্রহণীয় হবে,

সরকার ও স্বজনেরা কতটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, যে সাংসারিক স্বাচ্ছন্দে তারা এখানে ছিলেন তার কতটা পাকিস্তানে ফিরে পাওয়া যাবে-এই সংশয় অনেকের কাছেই ছিল। তাই তারা দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেও খাস পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশালের মতো কোনো দূরবর্তী শহর নয়, মধ্যবিত্তের অনেকেই প্রাথমিকভাবে বাসা বেঁধেছিলেন সীমান্তঘেঁষা খুলনা, যশোহর, কুষ্ঠিয়ায়। কিন্তু কেন? কারণ এইসব স্থান থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার সুবিধা। দাঙ্গা থিতিয়ে গেলে পুরনো ঠিকানায় যদি ফিরে আসা যায়-সংগোপনে এমন আশাও পোষণ করতেন অনেকে।

র‍্যাডক্লিফ রেখার আঁচড়ে রাতারাতি স্বভূমেই যারা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন সংখ্যালঘু হিসেবে তারা পূর্ববঙ্গে চলে গেলেও এতদিনের সমাজজীবনে তাদের আদৌ কি কোনো ভূমিকা ছিল না? কলকাতা পত্তনের কাল থেকেই এ শহরে মুসলিম প্রভাব সুবিদিত। শহরের বাড়বৃদ্ধির সঙ্গে বিভিন্ন পেশায় ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। কসাই, নাপিত, দর্জি থেকে বই বাঁধানোর কারিগর, কোচোয়ান থেকে সিগারেট প্রস্তুতকারক হিসেবে মুসলিমরাই ছিল শহরের সেরা। উনিশ শতকের শেষ পর্বে বিহার, ওড়িশা, এমনকি সুদূর ইউনাইটেড প্রভিন্স থেকেও অবাঙালি খেটে খাওয়া মুসলিমরা ভিড় করতে শুরু করেছিলেন। কলকাতার শিক্ষা এবং রাজনীতিতেও ধীরে ধীরে পা রাখতে শুরু করেছিলেন তাঁরা। পার্ক সার্কাস শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। মধ্যবিত্তের পরিচিত উন্নাসিকতাবোধ থেকে তারাও নিম্ন আয়ের মুসলিমদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেই চলতে পছন্দ করতেন। কলকাতার কলুটোলা, বৌবাজার, একবালপুর, এলাকায় নিম্নবিত্ত মুসলিম মহল্লার সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ।[২১] শুধু শহরাঞ্চলে নয়, ঘন ঘন নদীখাত পরিবর্তনের ফলে আবাদ অসম্ভব হয়ে ওঠা মালদহ জেলায় চাষের হাল ধরেছিল উত্তর ভারত থেকে 'শেরসাবদিয়া' গোষ্ঠীর মুসলিমরা।[২২] চরের বেলে মাটিতে চাষাবাদে পটু 'ভাটিয়া' মুসলিমদের প্রভাব দেখা দিয়েছিল মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে।[২৩]

পঞ্চাশের দশক থেকে কলকাতার মুসলিম মহল্লাগুলি ধীরে ধীরে নিঝুম হয়ে উঠেছিল। এলাকার চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী তাদের পূর্বপুরুষের বসত গুটিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন। বদলি নিয়ে নিশ্চুপে সীমান্ত পেরিয়ে গিয়েছিলেন বহু সরকারি কর্মী। দেশ ছেড়েছিলেন মুসলিম আর্দালি, পিওন, চাপরাশিরা। রাতারাতি বদলি নিয়ে উচ্চপদস্থ মুসলিমদের দেশত্যাগের ফলে বিভিন্ন সরকারি পদে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল তা সামলে দেওয়া গেলেও নিচুতলার কর্মীরা চলে যাওয়ায় সরকারি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আইন দফতর সমস্যায় পড়েছিল-যদিও এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন। গ্রামীণ মুসলিমরা চলে যাওয়ার ফলে কী প্রভাব পড়েছিল তারও পর্যালোচনা জরুরি।

তবে গ্রামীণ মুসলিমদের দেশত্যাগের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল দেশবিভাজনের অন্তত বছর চারেক পরে। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে গ্রামীণ মুসলিমরা দেশত্যাগ করতে কেন কাল বিলম্ব করেছিলেন? পূর্ববঙ্গের পরিবেশের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। চেনাজানার পরিধিও ছিল ছোটো। তাই অচেনা দেশে কে তাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে তা নিয়ে গভীর সংশয় ছিল নিম্ন ও মাঝারি আয়ের চাষী ও বিভিন্ন কলকারখানার মুসলিম শ্রমিকশ্রেণির। কিন্তু একের পর এক দাঙ্গার আঁচে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকায় মনোবলও একসময় ধাক্কা খেয়েছিল। গ্রামীণ মুসলিমদের গড়িমসির আরেকটি কারণ হল জীবন যপনের অন্যতম ক্ষেত্র মুসলিম প্রধান গ্রামগুলিতে যেতে হবে তাদের।

প্রথম থেকেই মুসলিম প্রধান মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি, ২৪ পরগণার মুসলিম মহল্লাগুলি ছিল নির্দিষ্ট এলাকায় এবং সংঘবদ্ধভাবে হিন্দু বসত থেকে একটু দুরত্ব রেখে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সেই গ্রামগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল। তাই গঠনের মধ্যেই ছিল 'একাত্ম' হয়ে থাকার লক্ষণ-যা তাদের বাড়তি 'মনোবল' জোগাত বলে মনে করেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ওয়াহেদ আলম। এই একাত্মবোধই দাঙ্গাপ্রতিরোধ করে; ভিটে আগলে পড়ে থাকার মনোবল জুগিয়েছিল এদেশীয় মুসলিমদের। বিভাজনের পরে ক্রমাগত অস্থিরতা সত্ত্বেও তাই দেশত্যাগের কথা প্রাথমিকভাবে ভাবতেই পারেনি তারা।[২৪]

১৯৫১ সালে পাকিস্তান সরকারের সুমারি হিসেব সঠিক হলে পূর্ব পাকিস্তানের মুহাজির সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ লক্ষ। দশ বছর পরে ১৯৬১ সালে পাক সরকারের জনগণনায় দেখা গিয়েছিল সে দেশে বর্ধিত জনসংখ্যার সাড়ে আট লক্ষই অবিভক্ত ভারত থেকে আসা উদ্বাস্তু।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম দেশত্যাগ করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হল দেশ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিমরা 'অচেনা দেশে' কি 'চেনা' ব্যবহার পেয়েছিলেন নাকি অবহেলার মুখোমুখি হয়েছিলেন? এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের বাংলা সাহিত্যের দিকে নজর দিতে হবে। গবেষক সমালোচক রফিকুল ইসলামের কথায়—"যে বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে গেছে, তত বাঙালি মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গে আসেনি—এসেছে অবাঙালি মুসলমান মোহাফেজের। ফলে দেশভাগজনিত মানবিক সমস্যাগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি সাহিত্যিকদের কাছে।" এই

সম্ভাবনাকে মেনে নিলে আমরা কি ধরে নেব, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সংকটের ছায়া পূর্ব পাকিস্তানে পড়েনি এবং তার আঘাত পূর্ববঙ্গের বাংলা সাহিত্যে জরুরি মনে হয়নি? আসলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমে বিপুল পরিমাণ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু চলে আসায় সে সংকট তৈরি হয়। পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গে অনেক মানুষ চলে যাওয়ার তেমন সংকট তৈরি হয়নি। তৈরি হয়নি বলেই তার অভিঘাত ও পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে পড়েনি। যারা চলে গিয়েছিলেন তারা সংখ্যায় বেশি, অনেক বেশি সম্পদশালী হিন্দুদের জমিতে, বাড়িতে, চাকরিতে, পেশায় সহজেই পুনর্বাসিত হয়েছিলেন। তাদের দীর্ঘদিন কোনো আশ্রয়শিবিরে থাকতে হয়নি, বা সংগ্রাম করে কোনো জবরদখল কলোনি গড়ে তুলতে হয়নি। তাছাড়া ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের কাছে দেশ বিভাগের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা। তাদের কাছে এই স্বাধীনতা ছিল দ্বিগুণ স্বাধীনতা—একবার ইংরেজ শাসন থেকে, সঙ্গে সঙ্গে এতদিনকার চেপে বসা হিন্দুদের আধিপত্য থেকে। সম্পন্ন হিন্দু, ক্ষমতাসীন হিন্দু, সরকারী উচ্চপদে অধিকাংশে আসীন। তাই হিন্দুদের ওপরে চাপ এবং বিদ্বেষ জমেই ছিল তাদের। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের ডাক্তার আমিরুদ্দিন আখন্দ যেমন নাগাড়ে আওড়ে চলেন—"মোসলমান হল হিদু জমিদারের প্রজা, হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক; হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট, হিন্দু ডাক্তারের পেশেন্ট।" হিন্দুদের আধিপত্যে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন নিম্নবিত্ত মুসলিম প্রজারা। দেশভাগ তাদের কাছে ছিল মুক্তির স্বাদ।

দেশভাগের ফলে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং পূর্ব বাংলায় এই শ্রেণি লাভবান হয়েছিল। এই লাভবান মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতর থেকেই লেখকরা উঠেছিলেন। তাই দেশভাগের ক্ষতির চেয়ে তাৎক্ষণিক শ্রেণিগত লাভটাই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। সে জন্যই হয়ত সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসে দেশ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে পাড়ি দেওয়া আসন্নপ্রসবা পুষ্পিতা এবং তার স্বামী আহমেদ মরিয়া হয়ে চাইছেন, নতুন দেশে জন্ম নেবে তাদের সন্তান। নবজাতকের নাম হবে প্রতীক আহমেদ, স্বাধীন দেশ পাকিস্তানের জন্মলগ্নের প্রতীক হবে সে। সুতরাং যন্ত্রণা নয়, পূর্ব-বাংলার দেশভাগের সাহিত্যে তাই নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলমানদের আশাবাদের কথাই শোনা যায়।[২৫]

তবে এই আশা বোধহয় সকলের ছিল না। তাই দেশ হারানোর স্মৃতির খোঁজ ও রয়ে গিয়েছে হাসান আজিজুল হকের সাহিত্যে। তাঁর 'আগুনপাখি' উপন্যাসের প্রৌঢ়া যখন দেশভাগকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন তোলেন "দ্যাশটা মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটি আমার লয়। আমাকে আরও বোঝাইতে পারলে না যি ছেলেমেয়ে আর যায়গায় গেয়েছে বলে আমাকেও সিখানে যেতে হবে। আমার সোয়ামি গেলে আমি আর কি করব? আমি আর আমার সোয়ামি তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ, খুবই আপন মানুষ জানের মানুষ, কিন্তুক আলেদা মানুষ।"[২৬] পশ্চিমবঙ্গের অনেক শিল্পী-সাহিত্যিককে দেশহারা মুসলিমদের কষ্ট ছুঁয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে উর্দু এবং হিন্দি সাহিত্য যতটা বিহ্বল পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ততটা নয়। তার কারণ পঞ্চাশের দশক জুড়ে বামপন্থার উন্মেষ। বামপন্থা বরাবরই মনে করে এসেছিল দেশ হারানো উদ্বাস্তু মানুষ স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক, তাদের নিয়ে সাহিত্যকে প্রশ্রয় দিলে পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।[২৭]

পরিশেষে বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের দেশত্যাগের পেছনে সাম্প্রদায়িকীকরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক সত্তার একোটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের জানা দরকার সাম্প্রদায়িকতার পেছনে কি 'Propaganda Politics'-এর ভূমিকা কি ছিল? যদি থেকে থাকে তাহলে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা কী ছিল? যেমন নদীয়ার সোনাডাঙায় ফিরেছিলেন কিছু মুসলিম। নদীয়ার হাঁসখালিতে কংগ্রেস নেতা বিকাশ রায় সভা ডেকে ঘোষণা করেছিলেন 'কোনো মুসলিমকে এলাকায় প্রবেশ করতে দেবেন না।' এই ঘটনায় কংগ্রেসের নেতাদের সুপ্ত সাম্প্রদায়িক মানসিকতাও বর্তমান ছিল। কোলকাতা, বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি জেলার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে মুসলিমদের বিতাড়না তথা দাঙ্গার পেছনে কি সমৃদ্ধ মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা-বাণিজ্য, উর্বর জমি দখলের অভিসন্ধি ছিল কিনা তা আলোচনা করা দরকার। আবার পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষের জমি কিভাবে বিনিময়ে হয়েছিল এবং তার চরিত্র কী ছিল তারও পর্যালোচনা জরুরি। এই বিনিময়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংশ্রব কোনো ভূমিকা নিয়েছিল কিনা তারও উত্তর খোঁজা প্রয়োজন। শহরে কারিগর ও শ্রমিক মুসলিমদের দেশত্যাগের ফলে শিল্পকারখানায়, বিশেষত পাঠশিল্পে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল কিনা তাও জানা জরুরি। আবার কোনো মুসলিম পরিবারের কেউ পশ্চিমবঙ্গে থাকলেও অন্যরা পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন, একই পরিবারে এই দ্বৈত ভূমিকার পেছনে কি কোনো কারণ ছিল? এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে গেলে আমাদের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যাওয়া পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের সম্মুখীন হতে হবে। তখন মানুষ কী মনে করতে চান সেটি আসল নয়, বরং অনেক বেশি জরুরী হল ছিন্ন মানুষ ঠিক কী মনে করতে চান না, এই প্রশ্নটা। আর তাদের

'স্মৃতির আর্কাইভ' থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পেলেই বোধহয় আমরা ঘটনার প্রকৃত সত্যতা ও সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে পারব এবং সংশয় থেকে মুক্ত হতে পারব।

তথ্যসূত্র:

১। Zolberg A.R., The Formulation of New States as a Refugee Generating Process, Annals, 267 May 1983.

২। Van Schendel William, 'Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclaves', The Journal of Asian Studies, Vol. 61, No. 1, February, 2002, p. 127.

৩। Rahman Md. Mahabubar and Van schendel, W., "'I am not a Refugee': Rethinking Partition Migration", Modern Asian Studies, 37(3), 2003, pp. 551-584.

৪। Siddiqui M.K.A., Muslims of Calcutta: A Study in Aspects of their Social Organization, Anthroppoligical Survey of India, Kolkata, 1947.

৫। মিত্র, অশোক, তিন কুড়ি দশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ১২৭

৬। Kamaluddin A.F.M., 'Refugee Problem in Bangladesh' in Kosinski, L.A. and Elahi K.M. (ed.), Population Redistributions and Developments in South Asia, Dordrecht, 1985, pp. 221-22.

৭। Rahman M.M. and Van Schendel, W., 2003.

৮। Dasgupta A., 'Denial and Resistance: Sylheti Partition, Refugee in Assam, Contemporary South Asia, 10(3), 2001, pp. 343-60.

৯। Rahman M.M. and Van Schendel, W., 2003.

১০। Ahmed S., Bangladesh: Past and Present. APH Publishing, 2004

১১। আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ২০০১

১২। Rogaly B., Who goes? Who Stays back? Seasonal migration and staying put among rural manual workers in Eastern India, Journal of International Development, 15(5), Vol. 2003, pp. 623-32.

১৩। Ghosh S., Cross-border activities in everyday life: the Bengal borderland, Contemporary South Asia, 19(1), 2011, pp. 49-60.

১৪। Fraser B. (Ed.), Bengal Partition Stories: An Unclosed Chapter, Anthem Press, 2008.

১৫। Chatterjee P., On religions and linguistic nationalism: the second partition of Bengl. Nationallism and religion: Perspective on Europe and Asia, 1999, pp. 112-28.

১৬। Roy H., A Partition of Contingency? Public discourse in Bengal, 1946-1947, Modern Asian Studies, 43(6), 2009, pp. 1355-1384

১৭। Khalidi O., From Torrent to Tricke: Inndian Muslim Migration to Pakistan, 1947-97. Islamic Studies, 37(3), 1998, pp. 339-52.

১৮। Fraser B. (ed.), 2008

১৯। Khalidi O. 1998.

২০। Sinha-Kerkhoff; K., Voices of difference: Partition memory and memories of Muslims in Jharkhand, India, Critical Asian Studies, 36(1), 2004, pp. 113-42.

২১। Mc. Pherson, Kenneth, The Muslim Mrcrocosm, Calcutta, 1918-1935, 1974, pp. 9-15.

২২। Mitra Asok, The New India, 1948-1955: Memories of an Indian Civil Servant, 1991, Bombay. P. 4.

২৩। Chatterjee S.P., Bengal in Maps, o. 44.

২৪। রায় রাহুল (স.), পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ : দেশ বদলের স্মৃতি, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ২৭-২৮।
২৫। শিকদার অশ্রুকুমার, 'ভাঙা বাংলার সাহিত্য', দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা, (সম্পাদনা : সেমন্তী ঘোষ), গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ১৯১।
২৬। হক হাসান আজিজুল, আগুনপাখি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ২৫২
২৭। রায় রাহুল, গাংচিল, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ২৫।